প্রিয়ভাষিণীর লাল টিপ যেন স্বাধীনতার সূর্য

সংশপ্তক হাসান

ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯৪৭-মার্চ ৬, ২০১৮

আটাশ ঘণ্টা অবচেতন
হায়নার ক্যাম্পজুড়ে পাশবিকতা
বাঁশের বেড়ার খুপরি ঘরে
চিৎকার করে স্বাধীনতা
সম্ভ্রম দান করে এই বদ্বীপের
সার্বভৌমত্ব কিনেছেন যিনি
লাল টিপে তার উঁকি দেয় দেশ
তিনি ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী

গানটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ললাটে লাল টিপ পরা এক মাতৃরূপ। যেন স্বাধীনতার লাল সূর্য ধারণ করে আছেন তিনি। তার উদ্দীপ্ত চোখ দুটিতে এক গভীর মায়া। যার সবটা জুড়ে অগাধ দেশত্ববোধ। বলছিলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভাস্কর ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণীর কথা যিনি সম্ভ্রমের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছেন এদেশের সার্বভৌমত্ব ও লাল সবুজ পতাকা। যিনি স্বাধীন দেশেও আজীবন যুদ্ধ করে গেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তির সঙ্গে।

বীরাঙ্গনা ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী ১৯৪৭ সালে খুলনায় তার নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা সৈয়দ মাহবুবুল হক ছিলেন খুলনার দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক। মা রওশন হাসিনা ছিলেন একজন প্রগতিশীল নারী। ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী তার শৈশবের দিনগুলি তার নানার বাড়িতেই কাটিয়েছেন। ফেইরি কুইন নামের সে বাড়িটি ছিল সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঘেরা। বাড়ির সবাই কোনো না কোনোভাবে শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। বাড়িটির এক ঘরে চলত কবিতা আবৃত্তির আসর তো অন্যঘরে হতো গান। আবার অন্য ঘরে জমিয়ে চলত ক্যারামের আসর। পাশের ঘরেই আবার চলত লেখালেখি। এমনই শৈল্পিক আবহে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন প্রিয়ভাষিণী।

তবে খুব বেশিদিন সেখানে থাকা হয়নি তার। বয়স যখন ৫ তখন নানার পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় পাড়ি জমান তিনি। ঢাকায় এসে প্রিয়ভাষিণীকে ভর্তি করা হয় টিকাটুলির নারী শিক্ষা মন্দির স্কুলে। বছর দুয়েক পর তার নানা অ্যাড. আব্দুল হামিদ যুক্তফ্রন্টের স্পিকার নিযুক্ত হলে নানার পরিবারের সাথে প্রিয়ভাষিণী চলে আসেন মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে। তাকে ভর্তি করা হয় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে। মিন্টো রোডের বাসভবনে থাকাকালীন অজস্র গুণী মানুষের স্নেহধন্য হন তিনি। তাদের মধ্যে ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণীদের মিন্টো রোডের বাড়ির তিন বাড়ি পরে ছিল শেরে বাংলার বাস। ছোটবেলায় খালাদের সাথে মাঝে মাঝেই ফজলুল হক সাহেবের বাড়িতে হাজির হতেন তিনি। তবে মিন্টো রোডে বেশিদিন থাকা হয়নি প্রিয়ভাষিণীর। ৯ বছর বয়সে কলেজ শিক্ষক বাবা খুলনায় নিজের কাছে নিয়ে যান তাকে। বাবার কাছে থাকা দিনগুলো প্রিয়ভাষিণীর খুব একটা মসৃণ ছিল না। নানার পরিবারে বাঁধনমুক্ত বাবুই পাখির মতো দিন কাটালেও বাবর বাড়িতে বিধি নিষেধের অন্ত ছিল না। বাবার সঙ্গে মতেরও অমিল ছিল কন্যার। ফলে মাঝে মাঝেই ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন তিনি। এদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার কড়াকড়ির মাত্রাও বেড়ে চলছিল। একসময় সেটাই কাল দাঁড়ায় কিশোরী প্রিয়ভাষিণীর জন্য। বাবার শাসনের শৃংখল থেকে রেহাই পেতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছাড়েন তিনি। কিন্তু কিশোরী বয়সে নেওয়া ওই সিদ্ধান্তই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। প্রেমিকের ঘরে সুখ পাননি প্রিয়ভাষিণী। জুটেছে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা। পাশাপাশি ছিল অভাব অনটন। তবে এসব থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না তার। ততদিনে ঘরে এসেছে তিন সন্তান। ফলে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলেও সন্তানদের দিকে তাকিয়ে জীবনের যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকেন তরুণী মা প্রিয়ভাষিণী। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। ১৯৭১ সালে ভেঙে যায় প্রিয়ভাষিণীর সংসার। এবার যেন নতুন করে স্বপ্ন দেখার পালা। দেখেছিলেনও তিনি। সব ভুলে আবার জীবনটাকে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গোছাতে চেয়েছিলেন নিজের মতো করে। কিন্তু ততদিনে জাতির জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হামলে পড়েছে এ দেশের নিরীহ মানুষজনের ওপর। পাকবাহিনীর এই অন্যায় নির্যাতন মাথা পেতে নেয়নি এদেশের মানুষ। দেশমাতৃকাকে রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারা। প্রিয়ভাষিণীর ভাইয়েরাও অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রণাঙ্গনে। বাড়ির অন্য সদস্যরাও আত্মনিয়োগ করে দেশমাতৃকার সেবায়। বাড়িটি হয়ে ওঠে মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প।

১৯৭১ সালেই প্রিয়ভাষিণীর জীবনে নেমে আসে এক বিভীষিকা। ঘটনাটি অক্টোবরের। তিনি তখন ঢাকায়। একদিন তার গৃহকর্মী মেয়েটি এসে জানায় পাকবাহিনী ঘিরে ফেলেছে তার বাড়ি। তাকে নাম ধরে ডাকছে তারা। প্রথমে কথাটি তেমন গুরুত্ব দেননি তিনি। সেসময় রাস্তা দিয়ে হায়নাদের পাশবিক হুল্লোড় ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রোজ রাতেই কাউকে না কাউকে তুলে নিত তারা। প্রিয়ভাষিণী ভেবেছিলেন সেরকম কিছু হবে। কিন্তু ঝুল বারান্দা থেকে উঁকি দিতেই বুঝলেন বিপদ ঘাড়ের ওপর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। পাকসেনারা তাকেই নাম ধরে ডাকছে। সাক্ষাৎ যমের সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি করে বললেন, ফেরদৌসি বাড়ি নেই। কিন্তু এতে কোনো ফায়দা হলো না। ওই দলের দুজন খানসেনা আগে থেকেই চিনত প্রিয়ভাষিণীকে। উপায় না দেখে তিনি পোশাক বদলানোর জন্য কিছুটা সময় চাইলেন। কিন্তু নিচ থেকে উত্তর এলো তোমার পোশাক পাল্টাতে হবে না আমরাই তোমার পোশাক পাল্টে দেব। পাকবাহিনীর দুজন দোসর হত্যার মিথ্যা অভিযোগে প্রিয়ভাষিণীকে গ্রেপ্তার করা হয় সেদিন। জিপে তুলেই অবর্ণনীয় নির্যাতন চলে তার ওপর। উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয় তাকে।

হায়নাদের অকথ্য গালাগাল আর বীভৎস উল্লাসে চাপা পড়ে যায় প্রিয়ভাষিণীর গগনবিদারী চিৎকার। ধর্ষিতা ভাষীণিকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে। ক্যাম্পে বাঁশের বেড়ার খুপরি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় তাকে। আটাশ ঘণ্টা পর জ্ঞান ফেরে প্রিয়ভাষিণীর। চোখ মেলতেই তিনি দেখতে পান তার মতো আরও অনেক নারীই বন্দি আছেন সেখানে। তাদের কেউ অর্ধনগ্ন আবার কেউ বিবস্ত্র। কারও আচরণও অসংলগ্ন। প্রিয়ভাষিণী বুঝতে পারেন হায়েনাদের পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন এসব। ভয়ে কুঁকড়ে ওঠেন তিনি। আজন্ম কারও কাছে মাথা নত না করলেও সেদিন মাথা নত হয় তার। এক পাক অফিসারের দুই পা ধরে কাঁদতে শুরু করেন তিনি। পাথরেরও মন গলে। তেমনটাই হয়েছিল সেদিন। তিনি ওই অফিসারের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হন ক্যাম্প থেকে। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার পর বুঝলেন, এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নেই। বদলে গেছে পুরোটাই। সবাই এমন আচরণ করছিল যে তাদের চোখের ভাষাই বলে দিচ্ছিল প্রিয়ভাষিণী একজন নষ্ট নারী। এমনকি তার নানার বাড়ির প্রগতিশীল সদস্যদের থেকেও একই আচরণ পাচ্ছিলেন তিনি। এরইমধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু ভাষিণীর জন্য শুরু হয় নতুন যুদ্ধ। সে যুদ্ধ সমাজের বীভৎস আচরণের সাথে লড়াই করে টিকে থাকার যুদ্ধ। সে যুদ্ধ কুলটা নাম নিয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রিয়ভাষিণী যখন হাঁপিয়ে উঠেছেন তখন পাশে এসে দাঁড়ান এক মহান হৃদয় পুরুষ। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান উল্লাহ। ১৯৭২ সালে প্রিয়ভাষিণীর জীবনসংগী হন তিনি। আহসান উল্লাহর হাতে হাত রেখে কিছুটা স্বস্তি মিললেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কোনো রদবদল ঘটে না। আগের মতোই সমাজের অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা বয়ে বেড়াতে হয় তাকে।

বলা হয়, সংকটে শিল্পের জন্ম। ফেরদৌসির বেলায়ও তাই ঘটেছিল। সামাজিকভাবে পরিত্যক্ত এই নারী আপন করে নেন দৈনন্দিন জীবনে পরিত্যক্ত জিনিসগুলো। ফেলে দেওয়া ডালপালাসহ বিভিন্ন উচ্ছিষ্টাংশকে দিতে থাকেন শৈল্পিক রূপ। তৈরি করতে থাকেন ভাস্কর্য। প্রথমদিকে প্রিয়ভাষিণীর এই শৈল্পিক সৃষ্টি গুরুত্ব পায়নি কারও কাছে। তবে ফেরদৌসি এতে খুঁজে পেয়েছিলেন মানসিক শান্তি। এভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর ফেরদৌসির এই ভাস্কর্যগুলো চোখে পড়ে চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের। তার অনুপ্রেরণাতে নিজের ভাস্কর প্রতিভার ওপর গুরুত্ব দেন প্রিয়ভাষিণী। এ সময় তার ভাস্কর্যে উঠে আসতে থাকে দ্রোহ সংগ্রাম যাপিত জীবনের আনন্দ বেদনা ও ভালেবাসা। এসএম সুলতানের সহায়তায় ১৯৯৪ সালে বেঙ্গলে প্রথম প্রদর্শনী হয় তার ভাস্কর্যগুলোর। সেইসঙ্গে তিনিও পরিচিতি পান ভাস্কর হিসেবে। দেশ বিদেশে ভাস্কর হিসেবে প্রিয়ভাষিণর পরিচিতি পান। কিন্তু তারপরও শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। কোথায় যেন জমাট বেধে খোঁচাচ্ছিল কষ্ট ও অতৃপ্তি। এই কষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামে চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে গঞ্জনা পাওয়ার। সে অতৃপ্তি ছিল ওই পতাকা ছিনিয়ে আনতে যে তারও সম্ভ্রম বিলিয়ে দিতে হয়েছে সেই গল্প স্বীকৃতি না পাওয়ার। একসময় সিদ্ধান্ত নেন তিনি খুলে বলবেন তার সব হারানোর গল্প। মাথা উঁচু করে শোনাবেন বীরাঙ্গনাদের ত্যাগের কথা। কিন্তু এতেও ভয় ছিল। এই ভয় নতুন করে সব হারানোর। আশঙ্কা ছিল মায়ের এই ত্যাগের কথা শুনে সন্তান যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়। যদি তারাও অস্বস্তিতে ভোগে মাকে নিয়ে। তবে এই ভয়টাকে আর প্রশ্রয় দেননি। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর জনসম্মুখে প্রথম বীরাঙ্গনা হিসেবে প্রকাশ করেন তার ওপর পাকবাহিনীর চালানো অবর্ণনীয় নির্যাতনের কথা। ওই পতাকার জন্য তার সর্বস্ব ত্যাগের গল্প। সেইসঙ্গে এ প্রজন্ম পায় একজন সাহসী মাকে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ওই পতাকার জন্য দুই লাখ মা বোনের ত্যাগ অপমানের নয় বরং গর্বের বিষয়।

ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণীর সৃষ্ট ভাস্কর্য

ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী ছিলেন আজন্ম যোদ্ধা। ৭১ এ যুদ্ধ শেষ হলেও তার লড়াই চলেছে আজীবন। ২০১৩ সালে দেশ যখন উত্তাল যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবিতে তখন প্রিয়ভাষিণীও যোগ দিয়েছিলেন সেই সংগ্রামে। আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে দিয়েছিলেন সাক্ষী। এরজন্য কম খেসারত দিতে হয়নি এই সংগ্রামী নারীকে। স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রাণনাশের হুমকি সর্বদাই তাড়া করে বেড়িয়েছে তাকে। তবুও গলা উঁচিয়ে লড়ে গেছেন দেশবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে। নিজের ভাস্কর প্রতিভার কারণে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন প্রিয়ভাষিণী। পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক স্বাধীনতা পুরস্কার। তবে তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি পান ২০১৬ সালে। সেবছর মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার কারণে মুক্তিযোদ্ধা উপাধি দেওয়া হয় তাকে। সেইসঙ্গে স্বাধীনতার ৪১ বছর পর এই বীরাঙ্গনা পান তার যোগ্য সম্মান। পাশাপাশি জাতির কাছে বার্তা পৌঁছে যায় মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্ভ্রম হারানো নারীরা কুলটা নয়, মুক্তিযোদ্ধা। চার বছর হলো প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে এ বীর নারী পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে। ২০১৮ সালের ৬ মার্চ রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সেই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটে খাদে পড়েও মাথা তুলে দাঁড়ানো এক নারীর গল্পের। যিনি নিজের আলোয় আলোকিত করে গেছেন এ সমাজ।